প্রকাশিত হয়েছে

মোবাইল টাওয়ার

মোবাইল টাওয়ারের দূষণ, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আইন বিষয়ক পুস্তিকা। ৬৪ পাতা, দাম ২০ টাকা, একসঙ্গে দশ কপির বেশি নিলে ছাড়ের সুবিধা

যোগাযোগ অমলেন্দু সরকার (৯৮৩০৮৮১২১৩) এবং জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 4 16 August 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৬ আগস্ট ২০১২ বৃহস্পতিবার ২ টাকা

• উঁচু মাচা পৃ ২ • স্বাধীনতা পৃ ২ • তথ্য অধিকার পৃ ৩ • মানেসরের ডায়েরি পৃ ৩ • জলা পৃ ৩ • টেরাকোটা পৃ ৪ • খাড়া দেউল পৃ ৪ • তিব্বত পৃ ৪

খোয়াইবনের অন্য হাটে

আজ শনিবার। গিয়েছিলাম খোয়াইবনের অন্য হাটে। সকালে এসেছি শান্তিনিকেতনে। বর্ষার দিন। মাথার ওপর কালো মেঘ। মাঝেমাঝেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দুপুরবেলায় সাইকেলে চেপে সোজা চলে গেলাম শ্যামবাটি ছাড়িয়ে ক্যানালের পাড়ে। ওখান থেকে ডানদিকে ঘুরে দেখি সোনাঝুড়ির বন। কিছুদূর যাওয়ার পর কানে এল বাউলের গান। চেয়ে দেখি সামান্য কয়েকজন কিছু পসরা সাজিয়ে বসেছে। এইটুকু ছোট্ট হাট? নাকি বর্ষার জন্য গ্রাম থেকে লোকে আসতে পারেনি? একজনকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, আর একটু এগিয়ে যান হাট দেখতে পাবেন। এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা বড়ো মাঠের চারদিকে গোল হয়ে মাটিতে দোকান সাজিয়ে বসেছে প্রায় ৫০–৬০ জন। আরও কেউ কেউ সাইকেলে কিংবা স্কুটার–মোটরবাইকে চেপে আসছে দোকান করতে। খোয়াইবনের এই হাট বসে প্রতি শনিবার। দুপুরবেলা বোলপুর আর আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিল্পী–কারিগর–দোকানদারেরা আসে এই হাটে। লালমাটি পুড়িয়ে কালোমাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, নারকেলের মালা আর ফলের আঁটি আর বিচি দিয়ে বানানো পাখি–জন্তু–জানোয়ার, কাঁথাস্টিচের ব্যাগ, কাঠের বাঁশি, একতারা–দোতারা–ডুগডুগি, স্লেট পাথরের ওপর আঁকা ছবি, তাঁতের শাড়ি, পুঁতির মালা–চুড়ি, আরও কত কীই না বিক্রি হচ্ছে। তার সঙ্গে আছে চা আর পিঠে–পুলি সহ নানান সুস্বাদু খাবার। তবে এই হাটের মধ্যে একটা বেমানান জিনিসও রয়েছে। শান্তিনিকেতন এখন বেশ অভিজাত টুরিস্ট স্পট। এই হাট এখন এক দ্রষ্টব্য স্থান। সারি সারি প্রাইভেট গাড়ি চেপে আসছে শহরের বাবু–বিবিরা। গ্রামের শিল্পী–কারিগররাও মোটা লাভের আশায় আজ তাদের মুখাপেক্ষী। কয়েকজন যুবককে দেখলাম, হাটের একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকো? — বোলপুর। আসলে হাট বলতে অতীতে স্থানীয় মানুষের মেলামেশা ও বিনিময়ের যে ঐতিহ্য ছিল, আজকের হাট সেখান থেকে সরে গেছে। শুনেছি ২০০৩ সাল থেকে এই হাট বসছে। তবু এই হাটের মধ্যে রয়েছে সরল গ্রামীণ জীবনের একটুকু ছোঁয়া। ৪ আগস্ট, জিতেন নন্দী, বোলপুর

‘কিচ্ছু না করেও সতেরো দিন জেল খাটল ছেলেটা’

২০ জুন ২০১২ নোনাডাঙার বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় প্রতিবাদে শামিল আন্দোলনকারীদের প্রথমে গ্রেপ্তার, পরে পুলিশ হেফাজত ও জেল হেফাজতে থাকার সময়ে জেলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেলের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন রঞ্জন •

বিগত প্রায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে নোনাডাঙায় বস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু কোনোভাবেই আন্দোলনকারীরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারছে না। এদিকে ২৪ মে–র ডেপুটেশনের পর সরকারের তরফে কোনো আলোচনা শুরু না হওয়া এবং বর্ষা এসে পড়ায় আন্দোলনকারীদের মধ্যেও সর্বশেষ অবস্থা বুঝে নেবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। নোনাডাঙার উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের মধ্যে যারা মাঠের মধ্যেই ঠিকানা গড়েছিল তাদেরকে ক্রমশ মিটিং মিছিলে আসা বা যোগ দেওয়ার ওপর প্রায় প্রতিদিনই চলছিল ভয় দেখানো ও হুমকি। এই অবস্থায় ২০ জুন উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসী এবং এই আন্দোলনের সমর্থকদের যৌথ সিদ্ধান্তে ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি হয়।

ধরনার সকালে প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান বিক্ষোভের পরিবর্তে পুলিশের দেখানো ধর্মতলার ‘ওয়াই’ লেনে বসতে বলা হয় আন্দোলনকারীদের। ছোটো ছোটো উপদলে জমায়েত হওয়া বস্তিবাসীদের নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয় এগারোটার পরিবর্তে দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ। ধরনা চলাকালীন উচ্ছেদ কমিটির এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চায়। এ ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২৬ জুন তারিখে মন্ত্রী দেখা করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর আন্দোলনকারী বস্তিবাসীদের কমিটির তরফে নোনাডাঙার মাঠে ঢোকার সামনে ময়লা ফেলার ভ্যাটটিকে তুলে দেবার আবেদন নিয়ে একটা সংশোধনী দাবিপত্র মন্ত্রীকে দিলে মন্ত্রী পুলিশ মারফৎ জানান যে কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না। ফলে আন্দোলনকারীরা সন্ধ্যের পরও তাদের ধরনা চালিয়ে যায়। রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ পুলিশ ১৫ মিনিটের মধ্যে আন্দোলনকারীদের স্থান খালি করে দিতে বলে। কিন্তু তাতে রাজী না হওয়ায়, হঠাৎ পুলিশ প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে লাঠি চার্জ শুরু করে।

এরপর তিনের পাতায়

কুডানকুলামের আন্দোলনকারীরা কলকাতায়

জেভিয়ার আম্মা : গত একবছর আমরা দুপুরের খাওয়া খাইনি

৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসে স্টুডেন্টস হলের সভায় দুই মহিলা প্রতিনিধির বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করেন বারুইপুরের সমাজকর্মী শশী আপ্পান •

সকলকে নমস্কার। আমার নাম জেভিয়ার আম্মা। আমার গ্রাম হল ইদিনথাকারাই। সবাই ভাবছে, কুডানকুলামে এখনই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এটা ভুল। ১৯৮৮ সালে, যখন আমার বয়স ২৪ বছর, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাশিয়ার পরমাণু চুল্লি নিয়ে চুক্তি হল, তখন থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। তখন ঘরে ঘরে টিভি ছিল না। সংবাদপত্রে যা ছাপা হত, তা সরকারের ছাড়পত্র পেয়ে ছাপতে হত। ফলে আন্দোলনের খবর লোকে পেত না। কিন্তু যখন জাপানে সুনামি হল, ফুকুশিমায় চুল্লিতে বিস্ফোরণ হল, সবাই টিভিতে দেখতে পেল পুরো ঘটনাটা, তাতে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল।

কেরালায় রাশিয়ান প্ল্যান্ট হওয়ার কথা ছিল। কেরলের মানুষ তা হতে দেয়নি। সেখানকার মানুষ শিক্ষিত। আমাদের ওখানকার সমুদ্র উপকূলের মানুষের শিক্ষার মান কম, তাই ওখানে ওরা চুল্লি বসাবে বলে ঠিক করল। আমরা সরকারের কোনো ক্ষতি করিনি। অহিংস পথে আন্দোলন চালাচ্ছি। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা আমাদের গ্রামে এসে বলেছিলেন, তোমরা আন্দোলন করো, আমি তোমাদের পাশে আছি। কিন্তু যখন তিনি ভোটে জিতে গেলেন, আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। আবার আমাদের জেলায় একটা বাই–ইলেকশনে ভোটের জন্য এসেছিলেন, সেখানেও যখন জিতে গেলেন, আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ালেন। এই জয়ললিতা একসময় আমাদের আন্দোলনে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়েছেন। পরে ভোটে জিতে গিয়ে আমাদের ওপর পুলিশি অত্যাচার শুরু করলেন। আমাদের গ্রামে বাচ্চাদের দুধ বন্ধ করে দিলেন। পুলিশ দিয়ে গ্রামে খাবারদাবার, ওষুধপত্র আসা বন্ধ করে দিলেন। রাস্তা বন্ধ, মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে সমুদ্রপথে অন্য শহরে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। আমরা সরকারের কাছে বলছি না, আমাদের খেতে দাও, পয়সা দাও।

আমরা আমাদের মাটিকে রক্ষা করতে চাই, যাতে আমরা নিজেদের জমিতে কাজ করে খেতে পারি। আমাদের ভবিষ্যত রয়েছে এই মাটির মধ্যে। আমরা বলছি, আমাদের মাটিকে নষ্ট করে দিও না, আমাদের স্বাস্থ্যকে বরবাদ করে দিও না। আমাদের জীবন–জীবিকা সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। মাছ ধরে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। পরমাণু চুল্লির তেজস্ক্রিয় বিকিরণ তো বাতাসে যাবে, সমুদ্রে যাবে। পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সমুদ্রের মাছ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। বাজারে সেই মাছ বিক্রি করলে তেজস্ক্রিয়তা মানুষের মধ্যে যাবে। আমাদের জীবিকা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এরপর দুয়ের পাতায়, আরেক আন্দোলনকারী মহিলার বক্তব্য

সার বিষ অগ্নিমূল্য; জৈবচাষে ঝুঁকছে চাষি

সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর, ৮ আগস্ট •

সুন্দরবনের একমাত্র পুরসভা অঞ্চল জয়নগর–মজিলপুর। আর এই জয়নগর মজিলপুরের পূর্বদিকে মাহিষ্যপাড়া, ৪নং ওয়ার্ড। এর শেষপ্রান্তে চাষের খেত। এখানকার বাসিন্দা তরুণ দাস (বয়স ৩২)। তরুণের তিন ভাই, তিন ভাইয়ের স্ত্রী, মা এবং তাদের ছেলেমেয়ে মিলিয়ে পরিবারের মোট সদস্য ১২ জন। তাদের পরিবারের ৫ বিঘা জমি রয়েছে। তরুণ নিজে চাষ করেন। ধান এবং গ্রীষ্মকালে টমেটো, ঢেঁড়শ চাষ করেন। তরুণের সঙ্গে মাহিষ্যপাড়ার খেত অঞ্চলে গেলাম। এখানে এবার কোনো জায়গায় ধান রোয়া হয়নি। কয়েকটা জায়গায় বীজতলা রয়েছে। প্রায় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস থেকে দেড় মাস ধরে বীজতলা রয়েছে, কিন্তু জলের অভাবে ধান রোয়া যাচ্ছে না। তরুণ একটা পুকুর দেখালো, সেখানে মাত্র দু–ফুট জল অথচ শ্রাবণ মাসে এখানে প্রায় সব পুকুরের জল কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। জলের অভাবের ফলে মাছের বেশ অভাব দেখা যাচ্ছে। চারা মাছ বা দেশি মাছ বেশ কম বাজারে।

গত বছর শ্রাবণের প্রথমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষি হিসেবে তরুণ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করে বিডিওর মাধ্যমে। অনেক ছোটাছুটি করেও তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। তরুণ কয়েকটা বীজতলা ও সবজির খেত দেখালেন, যেমন ঝিঙে, উচ্ছে, শশা। এগুলির চাষ জলের অভাবে নষ্ট হয়েছে।

তরুণ আমাকে চাষের একটা হিসাব দিলেন, কীভাবে চাষের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। গত বোরোর সময় মাঘ–ফাল্গুনের থেকে কীভাবে এবার চাষের খরচ বেড়ে গেছে সারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। গত বছর জিওটি সারের প্রতি কেজির দাম জয়নগর গঞ্জের বাজারে ছিল ১৪ টাকা। ৫০ কেজির বস্তার দাম ছিল ৭০০ টাকা। এবার তার দাম দাঁড়িয়েছে ১০০০ টাকা। অর্থাৎ কেজিতে ৬ টাকা করে বেড়েছে। বোরোর সময় ৭৪ কেজির বস্তার দাম ছিল ৮০০ টাকা। এবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০০ টাকা। পটাশ সার ৫০ কেজির দাম ছিল ৪০০ টাকা, এখন দাঁড়িয়েছে ৫০০ টাকা। ইউরিয়ার সারের ৫০ কেজির বস্তার দাম ছিল ৩০০ টাকা। এবার তার দাম দ্বিগুণ হয়েছে, ৬০০ টাকা।

সাধারণত নিজেরা চাষ করলেও কয়েকটা ক্ষেত্রে এখানকার চাষিদের জনমজুর নিতে হয়। বেড়েছে জনমজুরের খরচও। গত বছর জনমজুর ছিল ১৫০ টাকা রোজ, এবার তার মজুরি বেড়ে হয়েছে ১৭০–১৮০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। জমি চষার পাওয়ার টিলার ঘণ্টা প্রতি ছিল ১৮০ টাকা, এবার তা বেড়ে হয়েছে ২০০ টাকা। ফলের চাষের খরচ বেড়েছে। প্রসঙ্গত, ধান রোয়ার সময় ৫ বিঘেতে ২০টা রোজ লাগে। ধান কাটার সময় ১৫টা রোজ লাগে। ধান তোলার সময় অর্থাৎ খেত থেকে বাড়িতে নিতে ২০টা রোজ লাগে। নিজের মেশিনে ধান ঝাড়তে ১৫টা রোজ লাগে। তরুণের বড়ো দাদা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, ছোটো ভাইয়ের চানার দোকান আছে। গত বছর বোরো চাষে ক্ষতি হয়েছিল, তা এবার টমেটো ও ঢেঁড়শ চাষে কিছুটা পুষিয়ে নিলেও গত বছর সারের জন্য ৯ হাজার টাকা ধার করেছিলেন, এবার তা শোধ করতে হয়েছে লাভের টাকা থেকে। কিন্তু এবার সার বাকিতে পাওয়া যাচ্ছে না, নগদে নিতে হচ্ছে।

তাই এবার ওঁরা জৈব চাষের দিকে ঝুঁকছেন। ঘরের কাছে খালি জমিতে চেম্বার করে তার মধ্যে পুকুরের পানা, বাড়ির ব্যবহার করা সবজির খোসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিমপীঠের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে আনা বিশেষ ধরনের কেঁচো আনতে হবে। সেই কেঁচো চেম্বারে দিতে হয়। সেগুলো ঢেকে রাখতে হয় প্রায় সাত দিন। কেঁচোগুলো যে মল ত্যাগ করে সেটা ছাকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে জমিতে দিতে হবে।

ভ্যারাইটি সার বিষে বিভ্রান্ত চাষি; এক মাঠে সবাই জৈবচাষে গেলে সুফল মিলবে

বাসুদেব পরামাণিক, মাজদিয়া, মদনপুর, ১৪ জুলাই •

যে পটাশ সারের বস্তা (৫০ কেজি) গতবার ছিল দুশো টাকা বা দুশো আশি টাকা, এবার বিক্রি হচ্ছে হাজার টাকায়। সারের দাম বাড়ছে, কারণ সরকার জানে। ভরতুকি কমে গেছে। শুধু ইউরিয়ার দামটা কম। স্থানীয় সারের দোকানে সারের দাম তো বাড়ায়ই, কোনো রসিদ দেয় না কখনও। কিছু কিছু সার সরকারি কো–অপারেটিভ থেকে দেয়। সেগুলোতে হয়তো বস্তায় পঞ্চাশ কি একশো টাকা কম। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে সে সব নেই। শিমুরালি বা সণ্ডনা যেতে হবে, ৮–১০ কিমি দূরে। আনতে দশ পনেরো টাকা। সে এক কারণ। কিন্তু আরো বড়ো কারণ, আমাদের পাড়ার চাষিরা সব ওই স্থানীয় সারের দোকানির কাছে ধরা আছে। কিছু না কিছু বাকি আছে সবারই। তুমি নগদটা ওখান থেকে নেবা আর বাকিটা এখান থেকে নেবা — এটা হয়ও না। ও নেই বলে দেবে।

তাছাড়া, দোকানদার যা দাম চাইবে তাই দিতে হবে। বেশি দামাদামি করলে দেবে না। সারের দোকান (ডিলারশিপ) যার, এডিও অফিস থেকে লিস্ট করে দিয়েছে, কোন সারের কত দাম। বোর্ডে লেখা আছে দোকানে। আর সবকিছু পরিষ্কার, কিন্তু ওই সারের দামটাই পরিষ্কার না। অস্পষ্ট।

ভ্যারাইটি সার ও ওষুধ

বয়স্ক লোকজন বলে, প্রথম যখন ইউরিয়া সার উঠেছিল, তখন একবিঘে জমিতে দশ কিলো ইউরিয়া সার দিলেই ধান হয়ে যেত। এখন সেই জমিতে পঞ্চাশ কিলো ইউরিয়া দিতে হবে। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু দিতে হবে। আগে ফলিডল বলে একটা শুধু ওষুধ ছিল। ওই ফলিডল দিয়ে সব পোকামাকড় মরত। এখন পোকার যেমন ভ্যারাইটি আছে, ওষুধেরও তেমনি ভ্যারাইটি আছে। গাছটা কোঁকড়ানো হচ্ছে, তার জন্য একটা। লাল হচ্ছে, তার জন্য আরেকটা। এই ডাক্তারিটা করে, যাদের সারের দোকান, ওষুধের দোকান, তারা। চার পাঁচটা ওষুধ দিল, একটা না একটা খাটবেই। প্রথমদিন একটা ওষুধ নিলাম। খাটল না। পরদিন আরেকটা দিল, হল না। এইভাবে। এদিকে চাষির পকেট শেষ। আমি নিজেই অভিজ্ঞতা থেকে ওষুধ দিই, কিন্তু ঠেলায় পড়লে, নতুন কিছু রোগ হলে সেই দোকানদারের ডাক্তারিই মানতে হয়।

আর ওষুধের দামও অনেক বেড়েছে। গতবার সেবিন পাউডারের একশো গ্রামের দাম ছিল আটত্রিশ টাকা। এইবার পঁচিশ গ্রাম একজন নিয়ে এসেছে, বত্রিশ টাকা। প্রায় চারগুণ দাম বেড়েছে। এটাতে ফল গাছের পোকা মরে, ফলের বাড় ভালো হয়। রোগও এখন নানারকম হচ্ছে। আগে এত কিছু নাকি হত না। ফসল লাগিয়ে রাখত, নাকি এমনিই হয়ে যেত।

জমিতে হয়তো অত সার লাগেও না। কিন্তু মাটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায় হয় না। যেটা লাগে না, সেটাও হয়ত দিচ্ছি। পরীক্ষার জন্য এডিও অফিসে মাটি জমা দিলে তিনমাসে রিপোর্ট মেলে না। সময়মত রিপোর্ট না পেলে কে আর তিন চারদিন অন্য কাজ ফেলে রেখে যায়? যেতে হবে সেই শিমুরালি (বেসরকারি) বা কল্যাণী। অতদূর গিয়ে মাটি পরীক্ষা করানোর উৎসাহও থাকে না ছোটো চাষির। একেকটা অঞ্চলে ক্যাম্প করে যদি মাটি পরীক্ষা করায়, তাহলেও হয়তো করানো যেত।

সার ওষুধের চাষে জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক কথা। কিন্তু না করে চাষির উপায় নেই। জৈব সারে প্রথমে খরচ অনেক বেশি। পরে কমে যায়। রাসায়নিক সারে ঠিক উল্টো। ইউরিয়া সার জমিতে পাঁচ থেকে দশ দিন থাকে, তার মধ্যেই ওর ক্ষমতা শেষ। কিন্তু খোল অনেক দিন থাকে। দ্বিতীয়ত, জৈব সারে চাষ আমি একা করলে তো হবে না। আমার পাশে যে জমিতে কীটনাশক দিচ্ছে, তার এফেক্ট তো আসবেই। এক মাঠে সবাই যদি জৈব চাষে যায়, তাহলে হতে পারে।

সম্পাদকের কথা

ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ হোক

আসামের জাতিদাঙ্গা এখনও শান্ত হয়নি। ঘৃণার আগুন ইতিউতি ছড়িয়েছে পুনে, রাঁচি, মুম্বই, বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোর শহরে। দেশকালের সব পরিচয় — ভাষাগত, জাতিগত, বর্ণগত, দেশগত, অর্থনৈতিক শ্রেণীগত পরিচয় পেছনে রেখে দিয়ে ধর্ম পরিচয়কে সামনে নিয়ে এসে গোটা দেশ জুড়ে ফের এক ধর্মীয় দাঙ্গা তথা বিভাজনের মারণখেলা শুরু হয়েছে। এতে শামিল যেমন কিছু ইসলামিক সংগঠন, তেমনি বেশ কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ও বড়ো মিডিয়ার কলমচিরা। এতে আক্রান্ত, আহত, ছিন্নভিন্ন, আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে এবং হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ক্ষমতাধররা মৃত, আহত, ছিন্নভিন্ন কোনো মানুষ বা তার আত্মীয়স্বজনদের জীবনকথার মতো 'ছোটো' বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের বিতর্ক কেবল 'বড়ো' ইস্যু নিয়ে। যেমন, সীমান্তে 'বেআইনি' অনুপ্রবেশ, জনবিন্যাসের বদল, ভোটব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক ক্ষমতা। এসব বড়ো বড়ো বিষয় যখন আলোচনায় চলে আসে, তখন ছোটো অন্তরঙ্গ কথাগুলি দূরে সরে যায়। আর ক্ষমতাধর শ্রেণী, পার্টি, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া — এসব নিয়েই তো রাষ্ট্র। জেলখানার মতো রিলিফ ক্যাম্পে বুড়ি ছুঁয়ে 'তিনবেলা খাবার পাচ্ছ তো?' বলার মধ্যেই মানবিকতার দায় চুকিয়ে দেয় সে। ক্ষমতাধর সমাজে প্রমাণ করে ফেলা যায়, রাষ্ট্র মানবিক। কেউ কেউ অবশ্য এসবেরও ধার ধারে না, সোজা বলে দেয়। যেমন বলেছেন দেরাশাথ বসুমাতারি, আসামের বোড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের কর্তাব্যক্তি ও বোড়ো পিপলস ফ্রন্টের নেতা, হাওড়ার এক মানবাধিকার কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, 'আমাদের দেশ, আমাদের আইন, মানতে হবে।'

যেমন গুজব চলে, তেমনি চলে সংগঠিত মিথ্যাচার এবং অস্বীকার। সরকার অস্বীকার করছে অনুপ্রবেশের বাস্তবতা। বোড়ো নেতারা অস্বীকার করছে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘটানো অপকর্মের কথা। প্রশাসন এবং মিডিয়া অস্বীকার করছে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা। জনজাতি অস্বীকার করছে মানব সমাজের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে সরে যাওয়ার ইতিহাসকে।

অস্বীকৃতি হিংসা বাড়ায়। মানবিক স্বীকারোক্তি এবং অপরকে সইতে পারার মৌলিক স্বভাব শান্তি আনে।

কলাতলা হাটে স্বাধীনতা দিবস

পার্থ কয়াল, ফলতা, ১৫ আগস্ট •

ফলতার কলাতলা হাটে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগামী দিন কয়েক ধরে চলবে রক্ত পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সেই উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ। বলছেন, 'আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে, শরীরের একফোঁটা রক্ত দিলে শরীর খারাপ হয়ে যায় ... মানুষকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব আমাদের।'

কলাতলা হাটে একটি চায়ের দোকানে বসে কয়েকটি স্থানীয় ছেলে — কারখানায় কাজ করে তারা — – গল্প করছিল, 'গেলবার আমাদের পাশের পাড়ার সাথে স্বাধীনতা দিবসে মারপিট হয়েছিল। ... আর রোজই রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, আবার ...।' বলতে বলতে উঠে পড়ে। কলাতলা হাট থেকে খান্দালিয়া, সুন্দরিকা ছাড়িয়ে হলদীঘি গ্রাম। লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলের বাড়ি। একটা পাকা বাড়ির পেছনে মাটির দেওয়াল, বৃষ্টি অল্প অল্প করে হচ্ছে। পাকা বাড়ির পেছনে জল যাতায়াতের জায়গার পাশ কাটিয়ে কিছু জ্বালন জমানো আছে। লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল বসে আছেন পাশের বাড়ির দাওয়ায়। চোখে কালো চশমা। এবাড়ির বড়ো ছেলে গোপাল মণ্ডল মাস কয়েক আগে ফলতায় উঁচু বাড়ির কাজ করতে গিয়ে বাঁশের মাচা থেকে পড়ে মারা যায়। তারপর থেকে ছেলের শোকে চোখের জল ফেলে ফেলে চোখটা অন্ধ করে ফেলেছেন তিনি। তাঁর আরেক ছেলে, সতেরো আঠারো বছর বয়স, এই দিনকতক হল হলদিয়ায় কাজে গেছে। এক হাজার টাকা আগাম দিয়ে দশ কাঠা জমি নিয়েছেন ধান লাগাবেন বলে। কিন্তু বীজতলা করার মতো জমি পাননি। এর ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে বীজতলা জোগাড় করে তিনটে জন লাগিয়েছেন।

ছেলে কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে, টাকা পাননি?

— 'এখনও পর্যন্ত এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা পেয়েছি। ফিক্স করে দিয়েছি। বাকি টাকা এখনও দেয়নি।' পেছন থেকে ছেলের বাবা বলেন কিছু কথা, অস্পষ্ট স্বরে। মা ঝামটা মারেন, 'আমি যেটা বলছি সেটাই শোনো। আমাকে যেটা বলেছে, যেটা করেছে, সেটাই বলছি।' এইসব কথার মাঝেই বাড়ির তুলসিতলায় শাঁখ বাজে, ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে টিমটিম করে। 'এই আলো দেখছেন, সব হুক করে। আমাদের বিপিএল কার্ডও নেই, কিচ্ছু নেই। আটমাসের কোলের নাতিটা মায়ের সাথে মামাবাড়ি।'

ফিরে আসতে আসতে চোখে পড়ে স্থানীয় চায়ের দোকানে তাসের জটলা। কোনো কোনো বাড়িতে রাতের খাওয়ার তোড়জোড় চলছে। এই গ্রামগুলিতে বেশিরভাগ তফশিলি জাতির বাস। ইট ওঠা কাদা রাস্তায় চলতে চলতে খেয়াল করি, এক জায়গায় মিটার পঁচিশ ঢালাই করা রাস্তা। আস্তে আস্তে ছোটো পিরপানা, সুন্দরিকা, খান্দালিয়া পেরিয়ে কলাতলা হাটের পথে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলছে — রঙিলা মারো ঢোল না রে। গান শেষ হলে ঘোষকের ঘোষণা, এবারে স্বপন বসু গাইবেন সেই গান, থাকিলে ডোবাখানা হবে গো কচুরিপানা।

কুড়ানকুলামের আন্দোলনকারীরা কলকাতায়

প্র থ ম পা তা র প র

জেভিয়ার আম্মা

প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি একটা গ্রুপ তৈরি করব। সেই গ্রুপ এসে আপনাদের মতামত নেবে। যদি আপনারা বলেন, আমরা পরমাণু চুল্লি চাই না। আমি জায়গাটা ছেড়ে দেব। তারপর এখন কেন্দ্রীয় সরকার, কিছু বিজ্ঞানী আর রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে চুল্লি বসানোর কথা বলছে।

যখন ২০০৭ সালে সুনামি হল, জল এখানে সমুদ্র থেকে দু–কিমি ভিতরে চলে এসেছিল। পরমাণু চুল্লিতে জল দরকার। এখন আমরা গ্রামে এক কলসি জল আড়াই টাকা দিয়ে কিনি। খাবার জলের অভাব এখানে। সুনামি হলে যখন জল ভিতরে ঢুকে যাবে, তখন চুল্লির জন্য জল কোথা থেকে পাবে? এখন যে কোনো ভালো জিনিস কিনতে গেলে 'মেড ইন জাপান' লেখা থাকলে আমরা কিনি। জাপান টেকনোলজিতে উন্নত। তা সত্ত্বেও সুনামি হওয়ার পর জাপানের চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এখন আমাদের সরকার বলছে, তোমাদের দু–তলা তিনতলা বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি। সুনামি হলেও তোমাদের কিচ্ছু হবে না। আমাদের ওরা বোকা বানাচ্ছে।

নাগেরকয়েল থেকে এসে উদয়কুমার এখানে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা সরকার বা কারও ক্ষতি করবে না। ওঁর কথা মেনে আমরা মাসের পর মাস অনশন করেছি। অথচ উদয়কুমারের ওপর একটার পর একটা মোট ৮৩টা কেস চাপিয়ে দিয়েছে ওরা। তিনি আজ কন্যাকুমারি, নাগেরকয়েল বা থুথুকুড়ি কোথাও যেতে পারবেন না। গেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। যারা আন্দোলন করছে, সেই মেয়েদের ওপরও কেস চাপিয়েছে। আন্দোলনকারীদের ওপর অনেক মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

ওরা বলছে, এতদিন আন্দোলন চলছে, তার টাকা কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয় বিদেশ থেকে টাকা আসছে। থুথুকুড়িতে একটা সামাজিক সংগঠন আছে, সরকার তার অ্যাকাউন্ট সিল করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে টাকা নিই না। আমরা যখন মাছ ধরতে যাই, পাঁচশো টাকা রোজগার হলে তার থেকে পঞ্চাশ টাকা আমরা আন্দোলনের তহবিলে দিই। এইভাবে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। গতবছর ১৫ আগস্ট তালপাতা দিয়ে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেটাই এখনও আছে। আমাদের স্বামীরা মাছ ধরতে যায়, আমরা সপ্তাহের রান্না করে রাখি। বাচ্চারা স্কুলে যাবে, তাই সকালে ওদের জন্য রান্না করে দিই, ওটা ওরা দুপুরে খায়। তারপর সকাল আটটা–নটা থেকে আমরা আন্দোলনের মঞ্চে চলে আসি। গত একবছর আমরা দুপুরের খাওয়া খাইনি। আজ কলকাতায় এসে প্রথম দুপুরে খেলাম।

মেলট্রেড : পরমাণু কেন্দ্রের বিষে পেটে যে বাচ্চা হবে, সেও ধ্বংস হবে

আমাদের কথা শোনার জন্য আপনারা এসেছেন, সবাইকে নমস্কার জানাই। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করার জন্য আপনারা সবাই লড়ছেন, ভারতবর্ষের সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা যদি লড়াই করি, পরমাণু কেন্দ্র আমরা বন্ধ করে দিতে পারব।

আমরা একবেলা না খেয়ে কাটাতে পারি। কিন্তু আমাদের জীবনটাই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে কী থাকবে? এখন আমার কত বয়স? আমার জীবনটা ধ্বংস হবে বলে জানতে পারছি। আমার পেটে যে বাচ্চা হবে, সেও ধ্বংস হবে। তাই পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করতে হবে। এই পৃথিবীতে অনেক জাত আছে। কিন্তু আমি মনে করি, দুটোই জাত, পুরুষ আর নারী। আর কোনো জাত নেই। তাই পরমাণু চুল্লিটা যেখানেই হোক আমাদের বন্ধ করতেই হবে। প্রত্যেকেই আমরা অনশন করেছি। পনেরো দিন অনশন করার পর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখন সরকার আমাদের দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সেখানে চিকিৎসা ঠিক মতো হয়নি। ওরা মরেই যেত। আমরা বললাম, আমাদের যদি মরতেই হয়, নিজের মাটির ওপর মরব। সেইজন্য হাসপাতাল থেকে অসুস্থদের নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রথমে সরকার দশজনের বিরুদ্ধে কেস করেছে, তারপর তিনশো পনেরো জনের ওপর কেস চাপিয়েছে, তারপরে তিন হাজার মহিলার ওপরে কেস চাপিয়ে দিয়েছে। এই প্রথম আমি গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছি। যেখানেই পরমাণু চুল্লি হবে, আমাদের সেখানে গিয়ে বন্ধ করতে হবে। আমরা এক জায়গায় বসে আন্দোলন করিনি। পনেরো কিলোমিটার হেঁটে সমস্ত গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষকে নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি।

জয়ললিতা–মনমোহন সিং বলছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে কেন দিল্লিতে বা চেন্নাইয়ে চুল্লি বসানো হচ্ছে না? আমরা গরিব মানুষ, লেখাপড়া শিখিনি বলে তোমরা আমাদের ওপর পরমাণু চুল্লি চাপিয়ে দিতে চাইছ? আগে ওরা নিজেদের বাড়ির পাশে চুল্লি বসাক, তারপরে আমাদের বোঝাতে আসুক। আমরা আন্দোলন করে এখনও কোনো ফল পাইনি। আমার বয়স এখন একচল্লিশ। এই একচল্লিশ বছরেই আমার জীবনটা যাতে শেষ না হয়ে যায়, সেইভাবে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। যেখানেই পরমাণু চুল্লি বসানো হবে, সেখানেই আমাদের সবাই তা বন্ধ করতে যাব। আপনাদের সকলেই জানাই ধন্যবাদ।

বড্ড উঁচুতে মাচা, বড্ড নিচুতে বাঁচা

অরুণ পাল, বালি, ১৫ আগস্ট •

বেলপাহাড়ির তৃণমূল কর্মী শিলাদিত্য চৌধুরির জন্য আমাদের সত্যিই মায়া হয়। বেচারা একেবারেই সরল, সাধাসিধে। ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে খেলাটা চলছে তার নিয়মকানুন বেচারার একদম জানা ছিল না। নিয়মটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী–নেতানেত্রীরা নিরাপত্তার বলয়বেষ্টিত হয়ে এসে অনেক উঁচুতে বাঁধা মাচায় উঠে বক্তৃতা দেবেন আর 'জনগণ' দল বেঁধে, মিছিল করে এসে অনেক নিচুতে বসে মন্ত্রীর ভাষণ শুনে, প্রতিশ্রুতি শুনে হাততালি দেবে এবং বাড়ি ফিরে যাবে। 'নো কোয়েশ্চেন'। এটাই খেলার নিয়ম।

বেচারা শিলাদিত্য খেলার সেই নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দলের নেত্রী, মা–মাটি–মানুষের নেত্রী, অনেক আন্দোলন করে, অনেক মার খেয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন; সুতরাং সভায় দাঁড়িয়ে উঠে, ওই অনেক উঁচু মাচায় থাকা জনগণের মুখ্যমন্ত্রীকে চিৎকার করে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলে নিশ্চয়ই তিনি দেখবেন কেন তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এই ভেবেই গত ১০ আগস্ট বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় শিলাদিত্য নিচ থেকে চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো ২ টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছেন না, তিনি জানাতে চেয়েছিলেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হোমগার্ডের চাকরি তিনি পাননি, কমদামের সার তিনি পাচ্ছেন না।

বেচারা শিলাদিত্যকে গণতন্ত্রের নিয়ম ভাঙার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। সভায় তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর 'মাওবাদী' গালাগাল শুনতে তো হলই, এখন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৩৩২, ৩৫৩ এবং ৫০৬ ধারায় 'সরকারি কর্মচারীকে তার কাজে বাধা দেওয়া', 'ভয় দেখানো' ইত্যাদি চারটি 'অভিযোগে' — যার মধ্যে আবার দুটি জামিন অযোগ্য — মহামান্য আদালতের নির্দেশে ১৪ দিন জেল হাজতে থাকতে হচ্ছে। জয় হোক ভারতীয় গণতন্ত্রের!

পাঠ পরিক্রমা

'ধূসর পট পুরানো আখর'

তমাল ভৌমিক, ভবানীপুর, ১৩ আগস্ট •

বইয়ের নাম 'ধূসর পট পুরানো আখর', লেখকের নাম সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশনা সংস্থার নাম 'ঋতাক্ষর'। ৯০ টাকা দামের আশি পাতার এই বইটায় কিছু ইলাস্ট্রেশনও আছে। ইলাস্ট্রেশনের ছবিগুলো ও প্রচ্ছদ বেশ সুন্দর করে এঁকেছেন বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী। বইটাকে একধরনের স্মৃতিকথা বলা চলে। যদিও স্মৃতিকথায় আঁকা ছবির উপস্থিতি সাধারণত দেখা যায় না, তবু এই বইটায় ছবিগুলো দেখতে ভালোই লাগে।

বইয়ের শেষ অংশে লেখক সন্দীপের ভাষায় 'আত্মজীবনী তো লিখতে চাইনি, পঞ্চাশ বছর আগে ভবানীপুর জায়গাটা কেমন ছিল, সেই সময় আর তার সঙ্গে একটা পরিবারের ভাঙ্গনকথা — খণ্ড খণ্ড স্মৃতি জুড়ে আঁকতে গিয়েছিলাম এইরকম একটা মানচিত্রই'। পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে সন্দীপের মানচিত্র ভালোই ফুটে উঠেছে।

স্মৃতিকথায় সময়ের মানচিত্রে এমন কিছু ছবি ফুটে ওঠে যা ইতিহাসের পটে অনেক সময় ধরা পড়ে না। যেমন ১৯৬২–র ভারত–চীন যুদ্ধের সময় এই পাড়ার চীনা দন্ত চিকিৎসক ডাক্তার চুং–এর কথা। ডাক্তার চুং–কে তখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ায় ৮–৯ বছরের সন্দীপের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কেন? উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, 'ওটাই নাকি রীতি। যে দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, সেই দেশের সঙ্গে কারো জাতিগত সম্পর্ক থাকলে তাকে নাকি আগেভাগেই গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়।' এর বছর দুয়েক পরে সেই চীনা ডাক্তার ছাড়া পেয়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর শরীর ও মন দুই–ই ভেঙে যাওয়ায় এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। পরিণত সন্দীপ স্মৃতি থেকে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখছেন, 'এখন যাকে অরুণাচল প্রদেশ বলা হয়, সেই সময় তার নাম ছিল নেফা — নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি। কোথায় কোন সুদূর নেফায় বরফের পাহাড়ে যুদ্ধ হল আর কলকাতায় একটা লোকের জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। না, রণাঙ্গনে আমি যাইনি, তবে যুদ্ধ আমি দেখেছি।'

আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৭ সালের কথা লিখছেন সন্দীপ, 'রাজনীতির দিক থেকে ভবানীপুর ছিল খুব গোলমেলে জায়গা। বামপন্থীদেরই দাপট, কিন্তু ভোটে জেতে কংগ্রেস। ১৯৬৭ সালেও কংগ্রেসই জিতেছিল। আমাদের সে কী দুঃখ। ওই বছরই বোধহয় লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এলাকায় প্রার্থী ছিলেন গণেশ ঘোষ। চট্টগ্রাম বিপ্লবী। সেই সময় 'গণেশ ঘোষকে ভোট দিন' লেখা পোস্টার আমি দেওয়ালে সেঁটেছি। মাস্টারদার সহযোদ্ধা গণেশ ঘোষ। খুব গর্ব হত মনে। ১৯৯০–৯১ সালে গণেশবাবু যখন অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডে ছিলেন, আমি একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন কানে একেবারে শুনতে পান না। ফলে কথা বিশেষ হয়নি। তবে আমি যে একসময় তাঁর হয়ে প্রচার করেছি — এই কথাটা বলতে গিয়েছিলাম জাঁক করে। গণেশবাবু ঠিকই শুনতে পেলেন; আর জিভ কেটে বললেন, ছি ছি বড়ো খারাপ কাজ করেছিলেন। ... কেন তিনি ওই কথা বলেছিলেন, আন্দাজ করতে পারি। বামপন্থার হাল দেখে তাঁর মতো মানুষ তখনই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।'

সময়ের চালচিত্রে রাজনীতির আঁচ আজ যেমন লেগেছে সন্দীপের রচনায়, তেমনই তাঁদের বনেদি পরিবার ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ার কাহিনীও জায়গা করে নিয়েছে। অকপটেই আপন পরিবারের কথা বর্ণনা করেছেন সন্দীপ। দাদু বাবা মা সব আপনজন এমনকী নিজের দোষ–ত্রুটিও কোথাও ঢাকা দিতে চাননি। তিনি লিখছেন তাঁর মায়ের মৃত্যুতে, 'যে মা আমায় কোনোদিন ভালোবাসেনি, যে মাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি — সেই মার জন্য কেন যে এত কাঁদলাম, নিজেও জানি না।' ঘরের ও বাইরের নানা লৌকিক–সাংস্কৃতিক–সামাজিক পরিবর্তন সন্দীপের নজরে এসেছে। পুজোর ধুনুচি নাচ পাল্টে গেছে হিন্দি গানের সাথে টুইস্ট নাচে, মেট্রোরেলের খোঁড়াখুঁড়ি ভবানীপুরে মশার প্রচলন ঘটিয়েছে, অবাঙালি ব্যবসাদার ও উঠতি বড়োলোকেরা এসে ভবানীপুরের জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, পুরোনো বাড়ি বেচে দিয়ে উঠে গেছে এখানকার সাবেক বাসিন্দারা — এইসব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে ১৯৭৫ সালে সন্দীপের এই পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত আর এই স্মৃতিচারণ।

গোটা বইটাতে ভবানীপুর গড়ে ওঠার পুরোনো ইতিহাস এবং সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার চেষ্টার কিছু কথাও বলা আছে। সেগুলোও কম আগ্রহজনক নয়। আর আছে বেশ কিছু গুণীজনের কথা। লেখকের ভাষায়, 'রাজনীতি ও শিল্প–সংস্কৃতি জগতের অনেক খ্যাতকীর্তি মানুষের স্মৃতি মাথায় করে রেখেছে ভবানীপুর।' তাদের কথা লিখতে গিয়ে সন্দীপ একজনের কথা ভুলে গিয়েছেন। তিনি হলেন অখিলবন্ধু ঘোষ। এই সঙ্গীতশিল্পীর কথা অনেকেরই মনে নেই। অথচ তাঁর গাওয়া 'পিয়ালশাখার ফাঁকে', 'ও দয়াল বিচার কর', 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা', 'ওই যে আকাশেরও গায়' ইত্যাদি বহু গান আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি। ইনি থাকতেন ভবানীপুরের টার্ফ রোডে। টার্ফ রোডের কথা ও সেখানে বিপিন পালের থাকার কথা সন্দীপ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা। হেমন্ত থাকতেন রূপনারায়ণ নন্দন লেনে। তার পাশেই টার্ফ রোড। হেমন্তর গ্ল্যামারে, অনেকের মতো অখিলবন্ধুও ঢাকা পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে হেমন্তই বলেছিলেন, 'উনি গায়কদের গায়ক'। এই অখিলবন্ধু ঘোষকে আমি অর্থাৎ বর্তমান পাঠক দেখেছি, সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়ের বাসস্থান যে গলিতে, সেই চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট দিয়ে সকালবেলা জগুবাজারে বাজার করতে যেতে। দেখেছি এই আত্মভোলা শিল্পীর মাথার কাঁচা–পাকা চুল থাকত এলোমেলো, পরনের ধুতি–পাঞ্জাবীতেও পারিপাট্যের যেমন অভাব হাতের বাজারের থলিও তেমনই শীর্ণ ও মলিন। প্রায় রোজই দেখেছি। কারণ আমি গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই গলিরই বাসিন্দা।

দু-বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তথ্যের অধিকারে আংশিক জয়

পাওয়া গেল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জটেশ্বর শাখার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তদন্তের অসমাপ্ত রিপোর্ট

তপন চন্দ, মাদারিহাট, ৩০ জুলাই •

দুই বছরেরও বেশি আগে ২০১০ সালের ২৬ জুন মাদারিহাটের কিছু ব্যক্তি স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কের শাখা-ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এবং সেখানকার কিছু অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের জেড অফিস মুম্বইতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আমিও অভিযোগকারীদের মধ্যে একজন। ২৮ জুলাই ২০১০ তারিখে পার্শ্ববর্তী ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত জটেশ্বর শাখার ম্যানেজার তদন্তে আসেন মাদারিহাটে, সন্ধ্যের দিকে। তিনি অভিযোগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেককে তাদের লিখিত বক্তব্য জানাতে বলেন। সেই মতো কয়েকদিনের মধ্যে লিখিত বক্তব্য পেশ করা হয়।

অতঃপর ব্যাঙ্কিং অমবাডসম্যানের (লোকায়ুক্তের মতো, যে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের দেখাশোনা করে) তরফ থেকে অভিযোগকারী এক ব্যক্তির ডাক পড়ে, শিলিগুড়ির সেবক রোডের স্টেট ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক বিল্ডিংয়ে। দুজন অভিযোগকারী সেখানে গিয়েছিলাম, প্রতিবেদক এবং শিক্ষক গগনেন্দ্র নাথ রায়। সেখানে আমাদের বলা হয়, আপনাদের একাধিক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয়েছে, আপনাদের অভিযোগ সঠিক এবং নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তাঁর দোষ কবুল করেছেন। ফলশ্রুতিতে তাঁকে দুর্গম স্থানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে এবং বিভাগীয় একটি শাস্তি তাঁর হবে আর তা গোপন বলে আপনারা জানতে পারবেন না।

আমরা বিনীতভাবে জানাই, এই সামান্য বক্তব্যটি একটি পোস্টকার্ডে লিখে জানালেই হত। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি রেললাইনে রাজনৈতিক অবরোধ থাকায়, আমরা মাদারিহাট থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত মোটর সাইকেলে এসেছি। তারপর বাসে শিলিগুড়ি, তারপর রিক্সা/অটো করে সেবক রোডের স্টেট ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক বিল্ডিংয়ে।

তখন আমাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়, তাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের হাত-পা বাঁধা, দোষী ম্যানেজারকে ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারবেন না, শূলেও চড়াতে পারবেন না ইত্যাদি। আমরা গৃহীত ব্যবস্থায় সহমত পোষণ করলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হল, এরূপ লিখে দিতে পারি, অন্যথায় তাঁদের আর কিছু করার নেই। কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তদন্ত রিপোর্টই বা কী, তা লিখিত চাইলে ওঁরা বলেন, সেসব তাঁদের লিখে দিতে অসুবিধা আছে। যাই হোক, আমরা সহমত পোষণ না করায় ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসি। পরে বুঝেছিলাম, এইভাবে ডেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একের পর এক অভিযোগকারীদের কাছ থেকে 'বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে, অতএব অভিযোগ প্রত্যাহার', এরূপ লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ এক কায়দা!

'গোপন তথ্য, দেওয়া যাবে না'

এবার আসি তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে লড়াইতে। এই বিষয় নিয়ে ওই ২০১০ সালেরই ৭ জুলাই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জটেশ্বর শাখার তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন করি কিছু তথ্য পাওয়ার জন্য, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খামটি ফেরত আসে। খামের ওপর ডাকঘরের মন্তব্য, এইরকম কোনো ঠিকানা নেই, তাই ফিরিয়ে দেওয়া হল। এটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-এর ধারা/উপধারাকে অমান্য করা হয়েছে এবং আমার অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাই। তথ্য কমিশন আমাকে সত্বর '১ম আবেদন' এবং তাতে কাজ না হলে '২য় আবেদন' করতে বলে। যাই হোক, আমি প্রামাণ্য তথ্য সহযোগে ২০১০ সালের ১ ডিসেম্বর '১ম আবেদন' করি। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার আঞ্চলিক অফিস থেকে আমার কাছে ২৮ জানুয়ারি ২০১১ লেখা একটা চিঠিতে জানায়, যে সমস্ত তথ্য আমি চাইছি, তা প্রকৃতি অনুযায়ী গোপন এবং তথ্যের অধিকার আইনের ৮ (১)(ডি) এবং (ই) অনুসারে তা মকুবযোগ্য এবং আমার আবেদন কোনো জনস্বার্থ বিষয়ে নয়। কাজেই তারা তথ্য দিতে অপারগ।

২৩ মার্চ ২০১১ তারিখে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের আমার প্রশ্নের উত্তরে তথ্য দিতে নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে শুনানি করে হলেও। এছাড়া কেন যথা সময়ে তথ্য দেওয়া হয়নি তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে বলে, যাতে কমিশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের ওপর। এছাড়া আমাকে প্রয়োজন হলে '২য় আবেদন' করতে বলে। আমি তাই করি, ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে।

এরপর একবছর কেটে যায়।

অতঃপর ভিডিও কনফারেন্স

এ বছরের ২৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন আমার অভিযোগের ভিত্তিতে ভিডিও কনফারেন্সের জন্য নোটিশ দেয়, যা সংঘটিত হয় ২২ মে ২০১২ তারিখে। আবেদনকারী হিসেবে আমি ছিলাম জলপাইগুড়ির কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ের তথ্য কমিশনের জেলা অফিসে। ব্যাঙ্কের জন তথ্য আধিকারিক ছিলেন কলকাতার অফিসে। ভিডিও কনফারেন্স হয় ৫-৭ মিনিট। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে সম্মত হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন আদেশ করে, পনেরো দিনের মধ্যেই যেন বিনামূল্যে আমাকে আমার চাওয়া তথ্য দেওয়া হয়।

১১ জুন ২০১২ তারিখে আমাকে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তথ্য দেওয়া হয়। কিন্তু অসমাপ্ত সে তথ্য। তার মধ্যে আছে ওই ব্যাঙ্কের জটেশ্বর ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের তদন্ত রিপোর্টের প্রত্যয়িত কপি, ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক ম্যানেজারের 'গোপনীয়' লেখা চিঠি। কিন্তু এই তথ্যে আমি সন্তুষ্ট নই, কারণ, অভিযোগগুলির কপি দেওয়া হয়নি। এছাড়া, মোট এগারোজন অভিযোগকারীর মধ্যে আটজন, যাঁরা অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের নাম আছে তদন্ত রিপোর্টে। কিন্তু যে তিনজন, এই প্রতিবেদক, গগনেন্দ্র নাথ রায় এবং চিন্ময়ী রায়, যাঁরা অভিযোগ প্রত্যাহার করেননি, তাঁদের নাম তদন্ত রিপোর্টে নেই।

অসমাপ্ত রিপোর্টে আমি সন্তুষ্ট না হওয়ায় আপাতত ফের তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছি এবং ভিডিও কনফারেন্সের সিডি চাইছি। কিন্তু, দেরিতে হলেও, অসমাপ্ত হলেও, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার করে আমি কিছু তথ্য পেয়েছি। এটা তথ্যের অধিকার আন্দোলনের একটি জয়। আমরা প্রত্যেকে একটি দেশলাই কিনলেও কর দিই। সেই করের টাকাতেই দেশ চলে। তাই তথ্য দিতে সরকার বাহাদুর বাধ্য।

বেআইনি মোবাইল টাওয়ার, জানাল 'তথ্যের অধিকার'

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৬ আগস্ট •

বেহালার উপেন ব্যানার্জি রোডে জনৈক অনিল দাসের বাড়ির ছাদে টাটা টেলিসার্ভিস একটি মোবাইল টাওয়ার বসিয়েছে বেআইনিভাবে, এরকম অভিযোগ ছিল দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশীদের। ২৫ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিবেশী বনানী জাটি এবং সোমা সিনহার তরফে একটি তথ্য অধিকার আবেদন করা হয় কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। তাতে উক্ত মোবাইল টাওয়ারটি বসানোর জন্য পুরসভা অনুমতি দিয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। জবাবে ১০ জুলাই পুরসভা জানায়, সেরকম কোনো অনুমতি পুরসভা দেয়নি।

জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আসালোয়াস গ্রাম

অরুণ পাল, বালি, ৮ আগস্ট •

হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার বাওয়াল টাউনের কাছে আসালোয়াস গ্রামের ৩০০০ একর জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে শিল্প তালুক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'কিসান সংঘর্ষ সমিতি' কৃষকদের সংগঠিত করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২২ জুলাই তারা দিল্লি-জয়পুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মহাপঞ্চায়েতের ডাক দেয়। মহাপঞ্চায়েত চলাকালীন পুলিস জমায়েতের ওপর লাঠি চালাতে শুরু করলে মুহূর্তের মধ্যে এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। পুলিস যথারীতি তাদের ওপর ঢিল ছোঁড়ার অজুহাত দেখিয়েছে। পুলিসের আক্রমণে প্রায় চল্লিশজন গ্রামবাসী আহত হয়, গণবিক্ষোভে কয়েকটি সরকারি বাসে আগুন দেওয়া হয়। প্রায় ঘন্টা তিনেকের ওপর পুলিসের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ চলে।

আফস্পা-য় বলীয়ান রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে ফের খুন দুই কাশ্মীরি

অরুণ পাল, বালি, ৮ আগস্ট •

বছর পঁচিশের কাশ্মীরি যুবক হিলাল আহ্‌মদ দার কাজ করতেন শ্রীনগরের একটা সিমেন্ট কারখানায়। খুন হওয়ার দিন তিনেক আগে তিনি গ্রামের বাড়িতে ছুটি নিয়ে আসেন। গ্রামের নাম আলুশা হেলমতপাড়া। হিলাল গত ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় ইফতারের উপবাস শেষ করে গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে আর ফেরেননি। রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে প্রবল গুলির শব্দ শোনা যায়। বুধবার সকালে বাড়ির লোকেরা গ্রামবাসীদের থেকে জানতে পারে, গ্রামের নদীর ধারে হিলালের মৃতদেহ পড়ে আছে। পুলিস জানিয়েছে, সেনাবাহিনী প্রথমে দাবি করেছিল হিলাল একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদী, পরে জানতে পারে তিনি একজন সাধারণ নাগরিক।

দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার ২২ বছরের যুবক আকুইব হুসেন ছিলেন ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার, গত দু-বছর ধরে তিনি সিআরপিএফ ক্যাম্পে জল সরবরাহ করতেন। গত ৩১ জুলাই হুসেনের সাথে সিআরপিএফ সেনাদের কোনো একটি কারণে তক্কাতক্কি হয়, যার জেরে সিআরপিএফ তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানায়। সিআরপিএফ যথারীতি ট্রাক দুর্ঘটনায় হুসেন মারা গেছে বলে দেখিয়েছে।

কাশ্মীরে আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার আইন (আফস্পা) লাগু থাকায় সামরিক বাহিনী প্রায় যা খুশি করতে পারে।

পত্রিকার পাতা থেকে

টানা তেরো দিন কারখানা শ্রমিকদের দখলে

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (২)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে •

দিল্লি, নয়ডা, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিকেরা কাজ করে, তাদের ৭০-৭৫ শতাংশ কোম্পানি বা সরকারের নথিভুক্ত নয়। স্থায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি রয়েছে অস্থায়ী শ্রমিকেরা। অস্থায়ীদের মধ্যে রয়েছে ক্যাজুয়াল এবং ঠিকা শ্রমিক। ঠিকেদাররা সকলে রেজিস্টার্ড নয়। শ্রমিকদের মধ্যে সকলে ইএসআই এবং পিএফ পায় না। ফ্যাকট্রিগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের ৭৫-৮০ শতাংশ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন পায় না। ফ্যাকট্রিতে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা ডিউটি এক সাধারণ চিত্র। ৯৫-৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন পাওয়া যায় না।

এইরকম পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা কারখানায় কারখানায় ম্যানেজমেন্টের জুলুমের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়ত। রিকো অটো, ডেন্সো, ভিভা গ্লোবাল, হরসূর্য হেল্‌থকেয়ার, সেন্ডেন বিকাশ ফ্যাকট্রিতে প্রতিবাদী শ্রমিকদের কারখানার গেটের বাইরে বের করে দিতে ম্যানেজমেন্ট সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু হন্ডা ও হিরো হন্ডা-তে ঠিকা শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার পর তাদের গেটের বাইরে আনতে কোম্পানি ও সরকারের ঘাম বেরিয়ে যায়। মারুতি সুজুকির মানেসর ফ্যাকট্রির ভিতর ঘটনা অন্য রূপ নিল।

৪ জুন ২০১১ মানেসর ফ্যাকট্রির ভিতর এ-শিফটের শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের বচসা হয়। দুপুর তিনটে কুড়ি নাগাদ শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে বি-শিফটের শ্রমিকেরাও কারখানার ভিতর এসে জড়ো হয়েছে। ফোন করে সি-শিফটের শ্রমিকদের ফ্যাকট্রির ভিতর ডেকে আনা হয়। তিন শিফটের স্থায়ী শ্রমিক, ট্রেনি, অ্যাপ্রেন্টিস ও ঠিকা শ্রমিক মিলে আড়াই-তিন হাজার শ্রমিক কারখানার ভিতর জমা হয়। মানেসর কারখানা শ্রমিকদের দখলে চলে যায়।

শ্রমিকদের আচমকা এই পদক্ষেপে ম্যানেজমেন্ট হতবাক হয়ে যায়। হরিয়ানা সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার অসহায়! রাত ভোর হয়। কারখানা দখল করে শ্রমিকদের এই অভিনব হরতাল চলতে থাকে। শ্রমিকদের কারখানার বাইরে আনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত শ্রমিক-বিরোধী পক্ষ হায় হায় করতে থাকে। কারখানা দখলের তৃতীয় দিন ৬ জুন কোম্পানি বেছে বেছে ১১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে।

দিনের পর দিন কাজের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে সকলে একসঙ্গে কাটানো — – এমন দিন স্বপ্নেও শ্রমিকদের জীবনে আসেনি। প্রত্যেকে নিজের মতো করে এই অবসরকে উপভোগ করে। ব্যক্তিগত একান্ত গল্প, আড্ডা, হৈচৈ, গান, নাচ – — কী হয়নি এই দিনগুলিতে! শ্রমিকেরা অনেকেই বয়সে যুবক, তারা যেন পাখা মেলে উড়ছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানির সঙ্গে শ্রমিকদের কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা উভয় তরফেই দেখা গেল। অবশেষে গুরগাঁও সার্কেল দুইয়ের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার জে পি মানের মধ্যস্থতায় ১৬ জুন একটা চুক্তি হয়। তাতে ১১ জন ছাঁটাই শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এর আগে শ্রমিকেরা কাজে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা স্বরূপ তিনদিনের মাইনে কেটে নেওয়া হত। এই চুক্তিতে ঠিক হল, প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য একদিনেরই মাইনে কাটা যাবে। ১৮ জুন শ্রমিকেরা ফের কাজ শুরু করল। সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৩ দিন শ্রমিকদের দখলে থাকার পর ফ্যাকট্রির ভিতর সুপারভাইজর এবং ম্যানেজারদের রোয়াব আর তুইতোকারি সাময়িকভাবে বন্ধ হল।

জুন ২০১১-র আগে মানেসর ফ্যাকট্রিতে এ-শিফট শুরু হত সকাল ৭টার জায়গায় ৬টায় আর বি-শিফটে রাত সাড়ে বারোটার জায়গায় ১টা ৪০ মিনিটে ছুটি হত। প্রতিদিন এই দু-ঘণ্টার ওভারটাইম ম্যানেজমেন্ট হিসেবে দেখাত না এবং ডাবলের বদলে সিঙ্গল রেটে শ্রমিকদের পেমেন্ট করত। তেরো দিনের দখল আন্দোলনের পর এই ওভারটাইম বন্ধ হয়ে গেল। ***চলবে***

শান্তিপুরে পরিবেশকর্মীর ওপর হামলা

শমিত, শান্তিপুর, ১৩ আগস্ট •

ফের জলাধ্বংসের অভিযোগ শান্তিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে। শান্তিপুর পুর অঞ্চলের ৪নং ওয়ার্ডে একটি জলাভূমি বুজিয়ে ফেলার তোড়জোড় চলছে। অভিযোগ উঠেছে, ওই অঞ্চলেরই প্রাক্তন পুর কাউন্সিলারের পুত্র এই জলাশয় বুজিয়ে ফেলতে মদত দিচ্ছেন। শান্তিপুর পুরসভার ময়লা ফেলার ট্রাক্টর করে জঞ্জাল ভর্তি করে এনে ফেলায় এলাকার সাধারণ মানুষ হতচকিত। এলাকার জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একজোট হয়ে নানারকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এলাকার মানুষের সই সম্বলিত স্মারকলিপি জমা পড়েছে শান্তিপুর 'সমষ্টি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব' কার্য্যালয়ের আধিকারিকদের কাছে।

'শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি' শান্তিপুরে বিশাল বিশাল আমবাগান পুকুর জলাশয় গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের রক্ষা সহ মাটি ক্ষয়ের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে। 'মাটি মাফিয়া'রা শান্তিপুর অঞ্চলের বিভিন্ন বাঁধের মাটি কেটে ইটভাটায় পাচারে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাপক মাটি কেটে নেওয়ার জন্য বাঁধগুলি ও কৃষিজমি যথেচ্ছভাবে নষ্ট হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আসছে শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি এবং সাইদিয়াল ইয়ুথ সোসাইটি। এজন্য শান্তিপুরের পরিবেশ ধ্বংসকারীদের রোষানলে পড়েছে ওই দুই সংস্থা। অন্যতম সংগঠক গৌতমকুমার পালের ওপর নানারকম আক্রমণ করেছে পরিবেশ ধ্বংসকারীরা।

প্রথম পাতার পর

কিচ্ছু না করে সতেরো দিন জেলে

সঞ্জয় বলে একজন বস্তিবাসী প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আমরা ৩২ জন গ্রেপ্তার হই। সাথে রঞ্জন গুপ্তা বলে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর সাথে ধরনায় অংশগ্রহণকারী আন্দোলনকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো কিছু না করেই ছেলেটি ভারত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার দ্বারা ১৭ দিন জেল খাটল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ওয়াই' লেনে পুলিশ প্রশ্ন করে করে পথচলতি সাধারণ মানুষকে আসতে বাধা দিচ্ছিল এবং লাঠিচার্জের সময় মৃণাল জানা বলে একজন ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা কেড়ে নেয়। পুলিশের মারমুখী মেজাজের ছবি যে ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল তার থেকে প্রয়োজনীয় রিলগুলি খুলে নিয়ে পরে তারা ক্যামেরা ফেরত দেয়।

পুলিশের লাঠিচার্জের সময় আহত সঞ্জয়কে রাতে পুলিশ মেডিকেল কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু তার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন লালাবাজারের লকআপে জেলের ডাক্তার দেখে তাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে কিছু ওষুধ দেন। কিন্তু তাতেও সে খাওয়া শুরু করতে পারে না। পরে রাতের দিকে অনেক চেঁচামেচির পর ডাক্তার দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন।

লালবাজারের লকআপ জেলের কয়েদিদের যে পোশাক দেওয়া হয় তা কোনো সভ্য মানুষের জন্য হতে পারে না। একটা কাপড়ের টুকরো যার মাথার দিকটা কাটা। শরীরের নিচের অংশের জন্য হুক বা বোতাম বিহীন একটা প্যান্ট। টানা পাঁচ দিন সেই একই কাপড়ে কাটাতে হত। কোনোরকম কাচা ধোওয়ার ব্যবস্থা নেই। এমনকী স্নান করা বা দাঁত মাজার জন্য কোনোরকম সাবান, তেল বা মাজনের ব্যবস্থা থাকে না। পরে অনেক বলা কওয়ার পর শৌচালয়ে সাবান ও দাঁত মাজার জন্য নুন-তেলের ব্যবস্থা হয়। তাহলে কি কয়েদিদের জন্য সাবান ও দাঁত মাজার মাজনের ব্যবস্থা আছে, অথচ তা কয়েদিদের দেওয়া হয় না? না অন্য কিছু?

লালবাজার লকআপ জেলে আমাদের সাথে গ্রেপ্তার হওয়া সত্তরোর্ধ মোহন মণ্ডল নামে একজন ব্যক্তির মেঝেতে শোয়ার কারণে ঠান্ডা লেগে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন আমরা সকলে চেঁচামেচি করলে মোহন মণ্ডলের জন্য একটা কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়। জেলের খাবার খেয়ে এবং মেঝেতে শুয়ে অনেককেই সাইনাস, সর্দি-কাশি, পেট খারাপ, শ্লেষ্মায় ভুগতে দেখা যায়। আমি নিজেও প্রতিদিনই পেটখারাপে ভুগতাম। পরে জানতে পারি সেটা জলের কারণে। কারণ জেলের সকলেই বাইরে থেকে জল এনে খায়। আর আমাদের খেতে হত শৌচাগারের মধ্যে আসা কলের জল। প্রসঙ্গত বলা দরকার জেলের শৌচাগারগুলি উন্মুক্ত। এ জাতীয় ব্যবস্থায় অনেকেই অভ্যস্ত নয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের 'সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী পক্ষ' উদ্‌যাপন

অকৈতব মৈত্র, নবদ্বীপ, নদিয়া, ১ আগস্ট •

১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই কলকাতার কার্জন পার্কে ভিয়েতনামের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনকালে তৎকালীন সরকারের পুলিশ বিনা প্ররোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি চালায়। নিহত হন নাট্যপ্রেমিক 'প্রবীর দত্ত'। ১৯৭১ সালে ওই কার্জন পার্কের কাছেই শহিদ হন বিপ্লবী কবি ও সাংবাদিক সরোজ দত্ত। এই পক্ষ পালনের উদ্দেশ্যে ২২ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ নবদ্বীপ শাখা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এখানে গণসংস্কৃতি পরিষদের নিজস্ব শিল্পীরা ছাড়াও নবদ্বীপের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তপন ভট্টাচার্য্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন দেবাশিস নন্দী, বিশ্বরূপ হালদার এবং সত্তর দশকের আগুনঝরা দিনগুলির কবিতা বলেন এই প্রতিবেদক স্বয়ং — নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতা 'এই মৃত্যু-উপত্যকা আমার দেশ নয়'। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বনানী দাস, গোবিন্দ সাহা প্রমুখ।

বাংলা ব্যান্ডের দাপাদাপির যুগেও একঝাঁক তরতাজা ছেলের আধুনিক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গণসঙ্গীত পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষাকে স্বাগত জানাতেই হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন নীতিশ রায়, যাঁর কণ্ঠের গণসঙ্গীত মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 4 16 August 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

বনকাঁথির দেউল

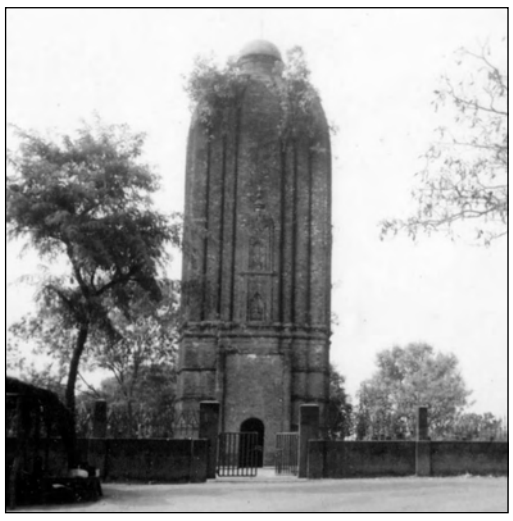

দীপংকর সরকার, হালতু, ১৪ আগস্ট, ছবি লেখকের তোলা •
বনকাঁথি একটি অচেনা ছোট্ট গ্রাম, বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে একটি নান্দনিক দর্শনীয় স্থান। ঘন জঙ্গল বেষ্টিত হাজার বৎসর পুরোনো একটি ইট নির্মিত টাওয়ার মন্দির দেউলপার্কে অবস্থিত। এই মন্দির ইছাই ঘোষের তৈরি। এখান থেকে দূরে দিগন্ত বিস্তৃত অজয় নদী প্রবাহিত। হাঁটু সমান জল। এই হাঁটু জলে জেলেরা মাছ ধরছে জাল দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে। নদীর তীরে বালি তুলে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরটি একটু উঁচু জায়গায়। সেখান থেকে অজয়ের তীরের দৃশ্য এক অনন্য অনুভূতি জাগায়।

কথিত আছে এই স্থান আগে ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে গোপভূমি নামে পরিচিত এবং আলাদা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ছিল পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আগে। মহীপালের পুত্র নয়াপালের শাসনের সময় থেকে পাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে শুরু করে। অনেক স্থানীয় শাসক নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল শাসন থেকে। এমনই একজন ইছাই ঘোষ নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ইছাই ঘোষ তখন স্থানীয় রাজা কর্ণ সেনকে পরাজিত করেন, অধুনা বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গা অধিকার করেন এবং নিজেকে স্বাধীন গোপভূমির রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। পরের বছর কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন ইছাই ঘোষকে হত্যা করে অজয় নদীর তীরে কাদুনে ডাসা বলে পরিচিত এক স্থানে। ইছাই ঘোষের সময়ই দেউল অর্থাৎ টাওয়ার তৈরি হয়েছিল, যদিও কে তৈরি করেছিলেন, তার কোনো রেকর্ড নেই। কেউ বলেন রাজা চিত্রসেন তৈরি করেছিলেন। ১১ শতাব্দীর ইটনির্মিত এই ৫০ ফুট উঁচু দেউল ৯৭৪ বৎসরের পুরোনো। মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গ আছে। লম্বা ও শক্তপোক্ত এই মন্দিরে উড়িষ্যার রথশৈলীর মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট।

এই মন্দির এখন 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' দ্বারা সংরক্ষিত। এর সীমানা প্রাচীর দেওয়া আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। মন্দিরেরে গায়ে গাছপালা গজিয়েছে ও চারিদিকে গরুছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্দিরের পিছনে কাঁকসার জঙ্গল। বাংলার প্রাচীন দূর্গা পূজা এখন এই জঙ্গলে হয়। একে বলে গড় জঙ্গলের শ্যামারূপা।

বনকাঁথি, দেউলপার্ক যেতে গেলে হাওড়া থেকে সকাল ৬–১৫ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস অথবা হুল এক্সপ্রেসে সকাল ৬–৪৫ এ গিয়ে পানাগড় স্টেশনে নামতে হবে। স্টেশন থেকে দার্জিলিং মোড় গিয়ে ইলামবাজারের বাস ধরতে হবে। নামতে হবে এগার মাইল মোড়। সেখান থেকে বাঁদিকে ট্রেকার ধরতে হবে দেউলপার্ক যাবার জন্য। সমস্ত রাস্তা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দুপাশে শাল, পলাশের সারি। লাল মাটির রাস্তার ওপর দিয়ে যখন ট্রেকার যায় তখন ধূলোর জন্য নাকে রুমাল দিতে হয়। আলোর ব্যবস্থা খুব একটা চোখে পড়ল না, নেই নগর সভ্যতার আঁচ।

মন্দিরের পাশে একজন ভদ্র মহিলা খোলা আকাশের নীচে চায়ের দোকান দিয়েছেন। মন্দিরের আশে পাশের দৃশ্যও বেশ মনোরম। বাংলার অনেক অতি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এখনও কালের নিয়ম মেনে প্রকৃতির বিরূপতা মেনেই এই মন্দির বহু ইতিহাসের সাক্ষী। আমিও সাক্ষী হয়ে রইলাম সেই ইতিহাসের।

টেরাকোটার গ্রাম

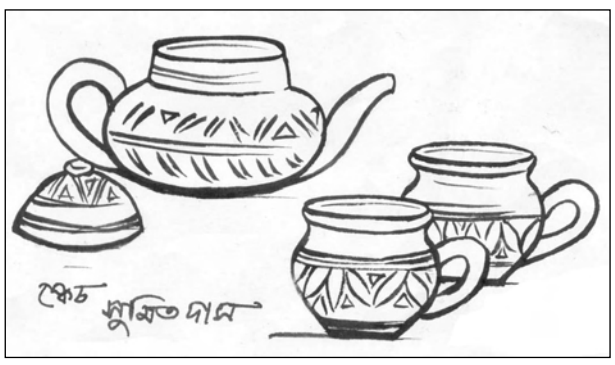

উজান চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর, ১৩ আগস্ট •
উত্তর দিনাজপুরের এক জমজমাট শহর কালিয়াগঞ্জ। সেখানে গত ২ আগস্ট আমরা গিয়েছিলাম 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয়ে। সেদিন অভিনয় বেশ হয় এবং এত দর্শক আসেন যা সচরাচর দেখা যায় না। অভিনয়ের পরের দিন সকাল থেকেই মনটা খুঁতখুঁত করছিল যে কখন কাছেপিঠে বেড়াতে যাব। তা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা বেড়াতে বেরোলাম। আমরা যাব 'টেরাকোটা গ্রাম'। নামটা প্রথম থেকেই অদ্ভূত লেগেছিল। একটা মজা হল এই যে জমজমাট কালিয়াগঞ্জ শহরটা থেকে ভেতরে ঢুকলেই একেবারে অজ পাড়া গাঁ। দুপাশে বিরাট ধানের খেত, মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল গাছ আর মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সেদিন রোদও উঠেছিল। চারপাশ অদ্ভূত মায়াবী লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে পৌঁছনো গেল 'টেরাকোটা গ্রাম'–এ। রাস্তার বাঁ পাশে জলা, তার পাশ দিয়ে বাঁশ গাছের সারি উঠে গেছে। তার নিচে দাঁড়িয়ে সে যে কি শান্তি তা বলে বোঝাতে পারব না। মনে হল এতদূর আসার সব ক্লান্তি ধুয়ে গেল। তারপর গ্রামে ঢোকা হল।

প্রত্যেক ঘরেই মাটির অসামান্য, অসাধারণ হাতের কাজ। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেল যে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল তা তৈরি হয় ছাঁচ দিয়ে। আর এই টেরাকোটা শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল তা তৈরি হয় হাত দিয়ে কেটে। একদম ছোটো থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই ওই মাটির কাজ করেন। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তারা মাটি দিয়ে গড়েছে। যেমন হ্যারিকেন — তার ভেতরে কী অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে চার ধার দিয়ে ফুটো করা। যাতে আলোটা ছড়িয়ে পড়ে নানা আকৃতিতে। সেটা আবার মাটিরই গোল গোল চাকতি দিয়ে দড়ি তৈরি করে ঝোলাবার ব্যবস্থা। আরেকটি দেখলাম প্রদীপ। একটা মাটির পাত্রের ওপর প্রদীপটা রাখা। তার ওপর আবার ঢাকনা। সেটাও কাটা কাটা। ঢাকনাটাকে খুলে প্রদীপ জ্বালানোর যে কাজ সেগুলো করে ফের ঢাকনাটাকে আটকে দেওয়া এবং যথারীতি কাটা কাটা পাত্রের মধ্যে দিয়ে আলো নানা আকৃতিতে ঠিকরে বেরোচ্ছে। এছাড়াও কাপ ডিশ, মুখোশ কত কী। এরপর গেলাম যেখানে এর মাটির মডেল তৈরি হয় সেখানে। চাক ঘুরছে। যিনি তৈরি করছেন তিনি শুধুমাত্র হাতের আলতো ছোঁয়ায় তৈরি করে ফেলেছেন ফুলদানী, কাপ, ডিশ, প্রদীপ, হ্যারিকেন। অসামান্য, অসাধারণ জাদু তার হাতের আলতো ছোঁয়ায়। সব ঘরবাড়িই মাটির তৈরি। এই অঞ্চলই হল আদি কালিয়াগঞ্জ। এই অঞ্চলের নাম কুনোর।

ক'দিন আগেও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অর্থাৎ সেই টেরাকোটা শিল্পীরা আমাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু কালিয়াগঞ্জ অনন্য থিয়েটারের বিভুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাদের তৈরি শিল্পসামগ্রী নিয়ে একটি মেলা হয়। তারপর থেকে তারা আমাদের চোখে পড়তে থাকে। তাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল। আমার কাছে এটাই আশ্চর্যের যে পুরুষানুক্রমে তারা ওই একটি অঞ্চলে তাদের হাতে গড়া মাটির শিল্প বানিয়ে চলেছে এবং তারা ভাল আছে। বর্তমানে সেখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আনন্দের খবর এই যে তাদের তৈরি শিল্প সামগ্রী বর্তমানে আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি শহরেও যাচ্ছে।

আমাদের কাছেই এত ভালো কয়েকজন যোগ্য, দক্ষ ও গুণী শিল্পী রয়েছেন। তাঁদের যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি বোধহয় আমাদের শিল্প সংস্কৃতির স্তরটাও কয়েকধাপ চড়ে যাবে।

শ্যামলী খাস্তগীরের পদচিহ্ন ধরে

অমিতা নন্দী, শান্তিপুর, ১৫ আগস্ট। স্কেচ সুমিত দাস •

শ্যামলী খাস্তগীরের মৃত্যুদিন ১৫ আগস্ট শান্তিপুরে তৃতীয় ধ্রুবপদ উৎসবে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হল। শান্তিনিকেতন থেকে আগত মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা গেল, শান্তিনিকেতনেও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে আজ তাঁকে স্মরণ করেছে। শান্তিপুরের সভায় তাঁকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন মন্থন পত্রিকার সম্পাদক জিতেন নন্দী, শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গী মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর সদ্য পাশ করা ছাত্র বসিরুদ্দিন এবং শ্যামলী খাস্তগীরের সমাধিস্থল তিলুটিয়া গ্রাম থেকে আগত বিশ্বজিৎ।

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শ্যামলীমাসির চলে যাওয়া গত এক বছরে শান্তিনিকেতনে এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। সভার পরিচালকদের পক্ষ থেকে পার্থসারথি চক্রবর্তী কবি জীবনানন্দের কবিতার সূত্র ধরে বলেন, শ্যামলীদির জীবনযাপনের মধ্য থেকে একটা দিকচিহ্ন আমরা পাই।

সভার দ্বিতীয় পর্বে সার্ধ জন্মশতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে বলেন ধ্রুবপদ পত্রিকার সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী।

খবরে দুনিয়া

তিব্বতীদের আত্মাহুতি, গণ জমায়েত বাড়ছে

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ আগস্ট। সঙ্গের এপি–র ছবিতে তিব্বতের রাজধানী লাসায় চীনা সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ, ১৪ আগস্ট •

চীন এবং তিব্বতে তিব্বতীদের আত্মাহুতির ঘটনা বেড়ে চলেছে। চীনের সিচুয়ান প্রদেশের আবা অঞ্চলে দুজন তিব্বতী স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন ১৩ আগস্ট। চীনা নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের নিয়ে যাওয়ার পর তাঁরা কেমন আছেন তা অজানা। এই নিয়ে ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৭ জন তিব্বতী গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হতে উদ্যত হয়েছেন। 'টিবেটান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' সংগঠনের সূত্র অনুযায়ী, ওই দুজনের একজনের নাম লুংটক, তিনি দক্ষিণ পশ্চিম চীনের কীর্তি মনাস্টারির একজন সন্ন্যাসী। আরেকজন সাধারণ মানুষ, নাম তাসি। এই ঘটনার পরই চীনা পুলিশ যখন ওই জায়গাটি পরিষ্কার করছিল তখন স্থানীয় তিব্বতীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এক তিব্বতীকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ।

একমাস আগে, ১৭ জুলাই ওই কীর্তি মনাস্টারির আরেক সন্ন্যাসী, ১৮ বছর বয়সি লোবসাং লোনজিন নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে স্থানীয় চীনা প্রশাসনিক ভবনের দিকে 'মুক্ত তিব্বত' স্লোগান দিতে দিতে হেঁটে যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। মনাস্টারির লোকেরা এসে মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যায়। ওইদিনই লোবসাং–এর ঐতিহ্য মেনে জলসমাধি হয়। স্থানীয় ভারখাম শহর থেকে পুলিশ তদন্তে এলে স্থানীয় মানুষ তাদের কীর্তি মনাস্টারির মধ্যে ঢুকতে বাধা দেয়। তখন পুলিশ মনাস্টারির উল্টোদিকে নদীর ওপারে কুচকাওয়াজ করে। স্থানীয় তিব্বতী দোকানপাট ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন বন্ধ ছিল।

এর আগে ২৬ জুন ওই কীর্তি মনাস্টারির এক সন্ন্যাসী লোবসাং সেরিং (২১)–কে চীনা প্রশাসনিক কর্তারা তুলে নিয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়রা পুলিশের কাছে তাঁর খোঁজ নিতে গেলে পুলিশ কিছু বলতে পারেনি। লোবসাং সেরিং এই পূর্ব তিব্বতের আবা অঞ্চলের এক গ্রামের ছেলে, খুব কম বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর বাবা এবং মায়ের নাম তাসি সেরিং এবং চুংকো।

এরও আগে ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর এই কীর্তি মনাস্টারির এক সন্ন্যাসী লোধু (৩৬) গ্রেপ্তার হয়। এই বছরের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তাঁর আত্মীয়রা খবর পায়, তিনি ভারখাম শহরের এক জেলে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁর তিন বছরের জেলে হয়েছে। কেন তাঁর সাজা, তা জানা যায়নি।

কীর্তি মনাস্টারি থেকে কান্যাক সেরিং এবং লোবসাং ইয়েসি 'টিবেট পোস্ট ইন্টারন্যাশনাল' নামক সংবাদমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল টিবেট নেটওয়র্ক' জানিয়েছে, তিব্বতে চীনা সেনাবাহিনীর ভয় অগ্রাহ্য করে তিব্বতীরা গণ জমায়েত করছে। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

মোবাইল নিয়ে প্রশ্নের উত্তর

মোবাইল অতিব্যবহারে স্নায়বিক রোগ হতে পারে

গত সংখ্যায় প্রকাশিত, ছাত্রদের মোবাইল নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক শুভাশিস মুখোপাধ্যায় •

ব্লু টুথ বেশি ব্যবহার করলে হাত কাঁপে কেন?

বেশি বা কম ব্যবহার কথাটা খানিকটা আপেক্ষিক। সাধারণভাবে একবারে ৬ মিনিটের বেশি (একঘন্টার মধ্যে) কেউ যদি মোবাইল ব্যবহার করে, তাহলে বিপদ বাড়ে। ব্যবহার করার সময় যত বাড়বে, বিপদের পরিমাণ তত বাড়বে। কতক্ষণ ব্যবহার করলে কার কতটা ক্ষতি হবে তা ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করে। হাত কাঁপার জন্য অনেকগুলো কারণ একসাথে কাজ করে। ব্লু–টুথের সঙ্গে জড়িত মাইক্রোওয়েভের গরম করার ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই যত সময় যায়, মোবাইল ফোনটা হাতে ধরা থাকলে হাতের স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং হাত তখন মোবাইল ফোনটির সামান্য ওজনটুকুও বহন করতে পারে না। আর একটি কারণ সম্প্রতি জানা গেছে। আমাদের স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার ফলে আমরা নানা রকম বিষয় অনুভব করতে পারি। ব্লু–টুথ দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের ফলে আমাদের স্নায়ুর বৈদ্যুতিক ধর্ম অনেকক্ষণের জন্য বদল হয়ে যায় এবং আগের অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় নেয়। খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে সেই ধর্ম আর আগের অবস্থায় ফেরে না। তখন এর ফলে স্নায়বিক রোগ হয়।

মোবাইলের অপপ্রয়োগ আটকানোর জন্য কোনো আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি?

আমাদের দেশে মোবাইল ফোন যে অপব্যবহার হয় এবং তার থেকে মোবাইল ব্যবহারকারীর যে ক্ষতি হতে পারে, একথা সরকার বা মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলির কেউই স্বীকার করে না বললেই চলে। এই নিয়ে মোবাইল সংস্থাগুলির মধ্যে রেষারেষি এবং সাধারণ মানুষের চাপে কিছু শিথিল আইন হয়েছে। কিন্তু সেই শিথিল আইনেরও প্রয়োগ কম। কে এবং কীভাবে সেই আইন প্রয়োগ করবে, তার স্পষ্ট কোনো নির্দেশ আইনে না থাকায় এই আইন প্রয়োগ প্রায় হয় না। সামান্য যা কিছু আইন রয়েছে, তা রয়েছে মোবাইলের থেকে বেরিয়ে আসা মাইক্রোওয়েভ যে তাপ সৃষ্টি করে তার জন্য। সেটাও যথেষ্ট নয়।

মোবাইলের বিকিরণ যে দেহের ডিএনএ–র ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়া করে, তার ফলে ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি বিকলাঙ্গ বা মানসিক বিকৃতির কোনো সম্ভাবনা আছে?

ডিএনএ–এর ওপর মাইক্রোওয়েভ যে ক্ষতি করে তার একটা অংশ কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যমান হয় আর আরেকটা অংশ সামনে আসতে ৫০ থেকে ১০০ বছর পর্যন্ত নিতে পারে। যদি ডিএনএ–এর ক্ষতি হয়, তা থেকে জিনের ক্ষতি হবে এবং সেই ক্ষতি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দৃশ্যমান হতে পারে। কয়েক জাতের মানসিক বৈকল্যের জন্য দায়ী জিন বা জিন সমষ্টি সম্পর্কে এখন যে তথ্য জানা যাচ্ছে, তা থেকে বলা যায়, অতিরিক্ত পরিমাণ মাইক্রোওয়েভের প্রভাবে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে মানসিক রোগ হওয়া অসম্ভব নয়।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.